ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 04. No. 01. August 2010

ফকির লালন শাহ ও কাঙাল হরিনাথ : মানবতার মুক্তিকল্পে প্রাসঙ্গিক ভাবনা

ড. মো: খালেদউজ্জামান*

সারসংক্ষেপ : বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ এবং কাঙাল হরিনাথের মধ্যে বন্ধুত্ব স্বরূপ সম্পর্ক ছিলো। উভয়েই মানবতার পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। আঠার-উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় ফকির লালন শাহ স্থান-কালপাত্রের ভেদাভেদকে ডিঙিয়ে জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ ও গোত্র প্রভৃতির উর্ধ্বে উঠে পৃথিবীর সমস্ড় মানুষকে এক অসাম্প্রদায়িক এবং মানবিকতাবোধের সর্বোচ্চ চেতনায় সমাসীন হয়ে স্বনিয়ন্ত্রিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্যিকারের মানুষরূপে প্রতিষ্ঠা করতে সাধনা করেন; সংগ্রাম করেন এবং সংগ্রামের সাহসিকতা 'মানুষ-মানবপ্রেম ও মানবতা' সঙ্গীতের মাধ্যমে সবার মাঝে তুলে ধরেন: এমন সমাজ কবে গো/ সৃজন হবে/যেদিন হিন্দু-মুসলমান/বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান/জাতিগোত্র নাহি রবে।আর কাঙাল হরিনাথ মজুমদার সমাজ–ধর্ম–গোত্রের ভেতরে অবস্থান করেও গ্রামের সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য ও তাদের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ-পীড়নের বির"দ্ধে সব সময় আন্দোলন-সংগ্রাম করেন এবং কলম ধরেন। মানবতা যেখানে অবহেলিত, পদদলিত সেখানেই তাঁর কণ্ঠধ্বনিত হয় মানুষ, সমাজ ও মানবতার জন্য। ফলে জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সকলের হৃদয়ে তিনি স্থান করে নেন। সাঁইজি লালনের 'সঙ্গীত-দর্শনে' মুগ্ধ হয়ে তিনিও বিস্ড়র 'বাউল সঙ্গীত' রচনা করেন। তবে তিনি শুধুমাত্র বাউল সঙ্গীতই রচনা করেননি; 'ব্রহ্মসঙ্গীত', 'ঐতিহাসিক সঙ্গীত', 'কালী কীর্তন' প্রভৃতি রচনা করেন। তিনি সামাজিক অবক্ষয় নিরসনকল্পে সাঁইজি লালনের মতো সাম্প্রদায়িকতার বির"দ্ধে সোচ্চার হতে সুর তোলেন এবং লেখনীর দ্বারা মানুষকে অনুপ্রাণিত করেন। আসলে ফকির লালন শাহ এবং কাঙাল হরিনাথের অবস্থান ভিন্নরূপ হলেও তাঁদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিলো আত্মিক; আত্মার আত্মীয়তা। 'মানুষ–মানবতা ও মানবধর্ম'ই উভয়ের চিন্ড়রাজ্যে প্রাধান্য পায়। মানবতা ও সাম্যের দিকদর্শনই তাঁদের জীবন-দর্শনের মূল লক্ষ্য। তাই 'মানবতার মুক্তিকল্পে' বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ এবং কাঙাল হরিনাথ একান্ড়ভাবে প্রাসঙ্গিক।

ফকির লালন শাহ অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের মানুষ। তিনি কোথায় কখন জন্মেছিলেন তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও আনুমানিক ইংরেজী ১৭৭২ মতান্ড়রে ১৭৭৪ সালে (১১৭৯/১১৮১ বঙ্গাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯০ সালের ১৭ই অক্টোবর (বাংলা ১২৯৭ সানের ১লা কার্তিক) কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার ছেঁউড়িয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়।[১] কেউ বলেন কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার ছেঁউড়িয়া গ্রামে তাঁর জন্ম, আবার কেউবা বলেন ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকু"ু থানার হরিশপুর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। উলেণ্টখ্য যে,

* সহকারী অধ্যাপক, আই ই আর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ।

ছেঁউড়িয়ায় তাঁর আস্ড়না ও মাজার শরীফ। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পরিবর্তনের সাথে সাথে লালনকে নিয়ে মানুষের কৌতূহল দিন দিন বৃদ্ধি পায়। মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে তাঁর জন্ম-গোত্র, ধর্ম-কর্ম, সঙ্গীত ও দর্শন নিয়ে। তাঁর বংশ পরিচয় নিয়ে সম্প্রতি বিতর্ক সৃষ্টি হলেও তাঁর ধর্মমত নিয়ে বিভ্রান্ড়ি সৃষ্টির অবকাশ নেই। লালন একজন বাউল। তিনি বাউল সম্রাট। বাউল ধর্ম বাঙালির ধর্ম; বাঙালির নিজস্ব মানস ফসল। এটা সমন্বয়ী ধর্ম। হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম এবং সূফী ধর্মমতের সমন্বিত রূপ। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, আঠার-উনিশ শতকের বাংলার মরমী বাউল সাধক ও কবিদের মধ্যে লালনশাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আলণ্টাহর পথে নিজেকে উৎসর্গ করেন বলে তিনি তাঁর গানে নিজেকে 'ফকির লালন', 'দরবেশ লালন', 'অবোধ লালন', 'অধীন লালন' 'সাঁই লালন' ইত্যাদি নামে পরিচয় দেন। আর মুসলমান শিষ্যরা তাকে 'সাঁই', 'ফকীর', 'ওলি', 'কামেল পীর', 'কুতুব', 'দরবেশ', 'তালেবুল-মাওলা' প্রভৃতি নামে এবং হিন্দু শিষ্যরা 'সাঁই', 'গোঁসাই' ইত্যাদি

নামে উলেণ্টখ করেন।[২] বাংলা সাহিত্যে তিনি লালন ফকির নামেই পরিচিত আর বাউল সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাউল।[৩]

একজন উচ্চ স্ড়রের সিদ্ধ সাধক হিসেবে লালনের জাতি-ধর্ম নিয়ে গবেষক ও সাহিত্যিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়া অনাকাঙ্ক্ষিত। তবু ভেদবুদ্ধিবশত মানুষ তাঁকে ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক গ"িভুক্ত করার চেষ্টা করেছে। কারো মতে তাঁর হিন্দু সম্প্রদায়ে জন্ম, কারো মতে মুসলিম সমাজে।

ফকির লালনের জীবনীর কোন নির্ভরযোগ্য আলোচনা আজও লিপিবদ্ধ হয় নি। কারণ তাঁর দীর্ঘ জীবনের কাহিনী রচনায় প্রয়োজনীয় উপকরণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম গীতিকবি চন্ডীদাসের মত লালনশাহ সারা জীবন আত্মলোপের সাধনা করেন। কোথাও তিনি তাঁর জন্ম-সন তারিখের উলেণ্টখ করেন নি। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আজ পর্যন্ড় তাঁর রচিত সহস্রাধিক গান সংগৃহীত হয়েছে; কিন্তু সে সবের মধ্যে এমন একটি রচনাও পাওয়া যায় নি - যার মধ্যে লালন জীবনীর সুস্পষ্ট তথ্য নির্দেশ বিধৃত। নিজের সম্পর্কে তাঁর এ নির্লিপ্তি প্রায় সীমাহীন। আত্মপরিচয় দানে লালনের সামান্যতম আগ্রহও ছিলো না; কারণ ফকির লালনশাহ নিজেকে একজন মানুষ বলেই জানতেন। জাতি, ধর্ম ও গোত্র প্রীতি মানুষকে ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। মানুষ আর মানুষ থাকে না। জাতি, গোত্র, বংশ ইত্যাদির উর্ধ্বে মানুষ। তিনি নিজেকে নিয়ে কখনো চিন্ড়া করেননি। সমাজের নিপীড়িত, নির্যাতিত, অবহেলিত, অসহায় মানুষকে নিয়েই ছিলো তাঁর চিন্ড়াভাবনা। নিজেকে উপস্থাপন করা, জাহির করা তাঁর জীবনদর্শনে কখনো স্থান পাইনি। বরং সমকালে ফকির লালনের প্রতি বিতৃষ্ণা থাকায় প্রতিবেশীরাও তাঁর সম্পর্কে খুব কমই জ্ঞাত ছিলো। তারা কখনো তাঁকে সুনজরে দেখেনি। জাতি-গোত্র-বংশ ইত্যাদি সম্বন্ধে লালন স্বয়ং বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। বাউল সাধক লালনশাহ্ নিজেই তাঁর গানের মাধ্যমে নিজেকে জাত পরিচয়হীন অসাম্প্রদায়িক বলে তুলে ধরেন —

"সবলোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে, জাতের কি রূপ দেখলাম না দুই
নজরে॥
যদি সুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারী লোকের কি হয় বিধান
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ
বামনী চিনি কিসেরে॥
কেউ মালা কেউ তসবী গালে
তাইতো কি জাত্ ভিন্ন বলে
আসা কিংবা যাবার কালে
জাতির চিহ্ন রয় কারে ॥
জগত বেড়ে জাতির কথা
লোকে গৌরব করে যথাতথা
লালন বলে জাতির ফাতা
ডুবাইছি সাধু-বাজারে ॥"৪

লালনের জীবন-সমীক্ষায় কবির নিজস্ব বক্তব্য যখন আবশ্যক মনে হয়, তখন দেখা যায় এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন একেবারেই স্বভাব-নির্লিপ্ত শিল্পী। এই ওদাসীন্যের জন্যে তিনি মধ্যযুগের বৈষ্ণব-কবি চন্ডীদাসের সঙ্গে তুলনীয়।

অথচ আত্মপরিচয়দানে অধিকাংশ মধ্যযুগীয় কবির উৎসাহ ছিলো দেদার; আভাসে-ইঙ্গিতে, সঙ্কেতময়তায় এবং মুসলিম কবিদের ক্ষেত্রে আরবী আবজাদ রীতিতে এ-আত্মপরিচয়-বিবৃতির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু লালন তাঁর গানে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য রক্ষা করেও নিজের পরিচয়দানে একেবারেই তৃষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন। আত্মপরিচয়ের এই অনাসক্তি তাঁকে মধ্যযুগের কবিদের কাছ থেকে পৃথক করেছে। আর সে কারণে গবেষকগণ তাঁর জীবনতথ্য আহরণে হয়েছেন বিভ্রান্ড়; তাই বিভিন্ন লোকসাহিত্যের গবেষকের দ্বারা সংগৃহীত লালন-গীতির কোথাও লালন-জীবনীর নিরঙ্কুশ তথ্যদান বা তথ্যনির্দেশ সম্ভব হয় নি। তাই আধুনিককালের গবেষকগণও তার কোনো কুলকিনারা করতে না পেরে বলতে বাধ্য হন, 'এই আত্মনিমগ্ন সংসার-নির্লিপ্ত সাধকের জীবন-কাহিনী রহস্যাবৃত'। গবেষকদের কথা বাদ দিলেও দেখা যায়, লালনের বিপুল সংখ্যক শিষ্যও তাঁর জীবন সম্পর্কে প্রায় কোনো জোরদার তথ্য পরিবেশন করতে পারেননি। সুতরাং হাতের কাছে যে তথ্য আছে অথবা শ্রুতিতে-অনুমানে যা লভ্য, এমন বিষয়ের ওপর নির্ভর করেই পন্ডিত-গবেষক ও ভক্ত শিষ্যেরা লালনের জীবন-তথ্য ও ঘটনাপঞ্জির নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

তবে স্মরণ রাখা দরকার মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ কিংবা খৃষ্টান ধর্মের অভিজাত শ্রেণী বাউল সঙ্গীত, বাউল দর্শন, কিংবা লালনকে নিয়ে গবেষণা করলেও লালনের প্রতি অনেকেই খুব সুপ্রসন্ন নয়। তথাপিও বাউল সম্রাট ফকির লালনের মৃত্যুর একশত বছরের উর্ধকাল সময় পর তাঁর রেখে যাওয়া সংগীত, ধর্ম, কর্ম ও দর্শন নিয়ে যখন জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিক ভাবে

দেশ-বিদেশে আলোচনা হচ্ছে, গবেষণা চলছে, যখন মানবতাবাদী হিসেবে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে; ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর জাতের বিচার নিয়ে আরো অনেক বেশি টানাটানি শুরু হয়। বিশ্ববাসীর নজর যখন ফকির লালনের ধর্ম ও সঙ্গীত-দর্শনের ওপর তখন এক শ্রেণীর অতিউৎসাহী লোক লালনকে নিজ নিজ বংশ-গোত্র ও সম্প্রদায়ের লোক দাবী করে। এক্ষেত্রে ক্ষিতিমোহন সেনের 'দাদু' গ্রন্থের বর্ণিত মহাপুরুষদের কথা মনে পড়ে যায়। ক্ষিতিমোহনসেন ভারতের নির্যাতিত সম্প্রদায়সমূহ থেকে যে সকল বিশাল বিশাল মানুষের উত্থান ঘটেছে, তাদের কারো কারো ওপর জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করেন। সন্ড়কবীরের ওপর তিনি অত্যন্ড় খেটেখুটে একটি চমৎকার বই লেখেন। কবীরের অনেকগুলো দোহার তিনি অত্যন্ড় বিশ্বস্ড় বাংলা অনুবাদ করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্ষীতিমোহন সেনের সংগ্রহ থেকে কবীরের ১০০টি দোহার ইংরেজি অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। চর্মকার সম্প্রদায় থেকে আগত 'দাদুর' ওপরও ক্ষীতিমোহন সেন একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ 'আমার স্মৃতি যদি আমাকে প্রতারণা না করে' রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওই গ্রন্থের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা লেখেন। এই 'দাদু' গ্রন্থে ক্ষীতিমোহন বাবু একটা মজার জিনিস খুঁজে বের করেন। ক্ষীতিবাবু বলেন, দাদুর আসল নাম ছিলো 'দাউদ'। দাউদ নামটি মুসলমান শোনায় বলে ব্রাহ্মণ পন্ডিতরা পাল্টে তার নাম রেখে ছিলেন 'দাদু'। লালন এবং কবীরের জন্ম বৃত্তান্ড় সম্পর্কে যে কাহিনীটা চালু আছে দাদুর বেলায়ও অনুরূপ একটা কাহিনী ব্রাহ্মণরা তৈরি করেন। দাদুর খ্যাতি-যশ দেখে ব্রাহ্মণরা বলেন তিনি ব্রাহ্মণ সন্ড়ান এবং চর্মকার পিতামাতার ঘরে প্রতিপালিত হন।

ক্ষীতিমোহনবাবু তাঁর 'দাদু' গ্রন্থে একটা বিষয় খুব জোর দিয়ে উচ্চারণ করেন। নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি যখন জ্ঞান এবং মনীষার বলে চারপাশ আলোকিত করেন, উঁচুবর্গের লোকেরা অত্যন্ড় সুকৌশলে নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্য থেকে উত্থিত মহাপুরুষদের নিজেদের সম্প্রদায়ের পাটাতনের ভেতরে ছিনতাই করে নিয়ে যায়। ভারতের নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে এমন সব শ্রেষ্ঠ মানুষদের উদ্ভব ঘটে বুদ্ধির দীপ্তি, প্রতিভার অসামান্যতা এবং জ্ঞানের গভীরতায় তাদের বেদ উপনিষদের ঋষিদের চেয়ে খাটো করে দেখার উপায় নেই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, যে সকল নির্যাতিত সম্প্রদায় এই মহামানবদের জন্ম দেন; তারা এই মহামানবদের নিজেদের মানুষ বলে অনেকদিন পর্যন্ড় দাবি করতে পারেননি। উঁচু বর্গের লোকেরা তাদের নাম পরিচয়ে ঠিকুজি-কুলজি সব পাল্টে ফেলেন। তেমনিভাবে বাউল সম্রাট লালনকে হিন্দুরা যেমন দাবি করেন হিন্দু, মুসলমানরা মনে করেন তিনি ছিলেন তাদের স্বজাতিভুক্ত। ফলে দেখা যায় এখনো পর্যন্ড় এ বিতর্কের কোনো সর্বসম্মত গ্রহণযোগ্য সমাধান হয়নি – লালন ফকির 'হিন্দু কি যবন'?৫

সত্য কথা হলো সাঁইজি লালন জাত-পাতের ধার ধারেন নি। অথচ বর্ণ হিন্দু এবং শরীয়তপন্থী মুসলমান এই জাত-পাত ও ধর্ম নিয়ে টানাহেঁছড়া করেন এবং লালন সম্পর্কে, বাউল সম্পর্কে অপব্যাখ্যা দেন। এ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় প্রচলিত ধর্ম ও জাত-পাতের উর্ধ্বে উঠে লালনের আদর্শ ও সঙ্গীত-দর্শন গভীরভাবে অনুশীলন করতে হবে। জাত-পাত বড় নয়, আদর্শই বড়।

এ প্রসঙ্গে গবেষক হিসেবে বলা যায় বাউল সাধক লালনের নিম্নবর্ণিত সঙ্গীতের মধ্যে তার যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যাবে।

"জাত গেল জাত গেল ব'লে একি আজব কারখানা
সত্য পথে কেউ নয় রাজি, সব দেখি তানা-নানা ॥
যখন তুমি ভবে এলে
তখন তুমি কি জাত ছিলে
কি জাত হবা যাবার কালে
সেই কথা কেনো বল না ॥
ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, চামার, মুচি
এক জলে সকলেই শুচি
দেখে শুনে হয় না রুচি
যমে তো কাকেও থোবে না ॥
গোপনে যে বেশ্যার ভাত খায়
তাতে ধর্মের কি ক্ষতি হয়
লালন বলে জাত কারে কয়
এই ভ্রম তো গেল না ॥"[৬]

এই গান থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় জাত-পাত মানুষের বড় পরিচয় নয়। সাঁইজি লালন শাস্ত্রচারী হিন্দু ও শরীয়তপন্থী মুসলমান উভয়ের দ্বারাই ধিককৃত ও নিগৃহীত হয়েছেন। লালন কোনোক্রমেই জাতি বা ধর্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে থাকেননি। তিনি ছিলেন জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে, 'অখণ্ড মানব-ঐক্যের' ধারক, বাহক ও ঘোষক; সঙ্গীত'ই তার প্রধান বাহন। তাই জগৎবাসীর প্রতি উদার দৃষ্টি রেখে তিনি 'গান' গান —

"নানা বরণ গাইরে ভাই, একই বরণ দুধ
জগৎ ভ্রমিয়া দেখিলাম মানুষ একই মায়ের পুত।"[৭]

লালন জীবনভর নিষ্কলঙ্ক ধর্মীয় জীবনযাপন করে গেছেন। তাঁর ধর্মসাধনার মূলে ছিলো অখণ্ড মানবপ্রীতি; আর এই প্রীতিবশে মানবজীবনকে তিনি দেখেছেন জাতি-ধর্ম-বর্ণের বহু উর্ধ্বে। সেজন্যে তাঁর সাধনতত্ত্বে 'মানব' কোনো বিভাগ-উপবিভাগের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। সৃষ্টির রহস্য বিশেণ্ঢষণ করে তিনি যে-তত্ত্বের সন্ধান পান, সে-তত্ত্বই হচ্ছে এই মহাসাধকের দৃষ্টিতে 'মানুষ-তত্ত্ব'। এই তত্ত্ব অনুসারে মানবদেহের অভ্যন্তরে বস্তুস্বরূপে বিশ্বস্রষ্টার অধিষ্ঠান। এই বিশ্বস্রষ্টার সান্নিধ্যলাভের উপায় নির্দেশ করেন 'চেতন-গুরু' বা 'মুর্শিদ'।

বাউল সাধক ফকির লালনের জন্ম-সন, তারিখ, স্থান, বর্ণ-গোত্র নিয়ে বিতর্ক থাকলেও মৃত্যু-সন, তারিখ স্থান এবং ধর্ম নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। তাঁর ধর্ম 'বাউল ধর্ম' সুতরাং ফকির লালন হিন্দু না মুসলমান তা নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে সময় নষ্ট করার চেয়ে তাঁর আদর্শের আলোকে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়। তাঁর বড় পরিচয় তিনি একজন বাউল। শুধু তাই নয়, তিনি একজন আধ্যাত্মিক সাধক, মানবপ্রেমিক ও অসাম্প্রদায়িক এবং

মানবতাবাদী দার্শনিক।

বাউলকে নিয়ে লালনকে নিয়ে লালনের জীবদ্দশায় যত সমালোচনাই হোক না কেন সার্বিক ধ্যান-ধারণা, সঙ্গীত, ধর্ম-কর্ম ও দর্শন প্রভৃতির আলোকে মানুষকে ভালবেসে 'মনের মানুষকে' পাওয়ার সার্বজনীন অক্ষয় সত্য সৃষ্টির গৌরব পুরোপুরিভাবে বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের। এক্ষেত্রে তাঁর বিশেষত্ব এখানেই, যে সময়ে কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি প্রচলিত ধর্মের দোহাই দিয়ে কিংবা অপব্যাখ্যা করে মানুষের সমস্ত ভালবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিদ্যাবুদ্ধি একেবারে জলাঞ্জলি দিয়ে মানুষের জীবনকে অস্থির করে তোলে সেই সময়ে বহু বর্ষব্যাপী প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কারের সমালোচনা করে তিনি এক 'অনন্ত সত্যের' স্বরূপ নির্ণয় করেন। সে সত্য সমগ্র মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি 'মানবতা' মানষের অবশ্যই পালনীয় বিধি। তিনি বুদ্ধিবৃত্তির অভাবজনিত ঘোর অরাজকতার সে-দিনে সাধন-ভজন ও সঙ্গীতের মাধ্যমে মানুষকে ভালোবেসে বিষয়সমূহের প্রকৃত মীমাংসা উদ্ধারের উপদেশ দেন। অজ্ঞান তিমির দূর করে মানুষ যাতে 'নির্ভুল ধারণার' সাহায্যে 'সামাজিক মঙ্গল' সাধন করে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন অতিবাহিত করতে পারে তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় লালনের ধর্মমত ও সঙ্গীত-দর্শনে।

আসলে আঠার-উনিশ শতকে এদেশের সাধারণ শূদ্রশ্রেণী নানা কারণে অসহায় হয়ে পড়ে। তাঁদের জীবনে কোন সামাজিক নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা না থাকায় যেকোন সময় নেমে আসত উচ্চবর্ণের দমন-পীড়ন কিংবা ফতোয়া। সাঁইজি লালন উচ্চবর্ণের ভ্রূকুটির বাইরে ব্রাত্যজনের বাঁচাবার জন্য একটা জায়গা তৈরি করার মানসে বাউল ধর্ম ও সঙ্গীত-দর্শন প্রচার করেন। এর উদ্দেশ্য নিছক প্রতিবাদ নয়; টিকে থাকারও ব্যাপার বটে। সংকীর্ণ শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে বাঁচা নয়, উদার মানবতা নিয়ে সহজ করে বাঁচা। তাই প্রচলিত ধর্মীয় সকল আচার সর্বসত্তার বিরুদ্ধে তাঁর অস্ত্র ছিলো জাতভেদহীন সমন্বয় এবং নতুন মানবতাবাদী সহজ ধর্মাচরণ। আর তা হলো – 'বাউলধর্ম'। সুতরাং বাউল ধর্মমত এবং সঙ্গীত-দর্শনে মানুষই মুখ্য। মানবতা ও মানবপ্রেমই এই ধর্মমত এবং সঙ্গীতের মূল উৎস। শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বাউল কিংবা লালন জাতপাতহীন অসহায় নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের হৃদয় জয়ের মাধ্যমে দর্শনের পাতায় স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙলায় যে মণীষীরা জন্মগ্রহণ করেন – তাঁদের মধ্যে কুমারখালীর হরিনাথ মজুমদার ওরফে কাঙাল হরিনাথ বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৮৩৩ সালে (বাংলা ১২৪০ সনে) কুষ্টিয়া জেলায় (তৎকালীন নদীয়া) কুমারখালী থানার (তৎকালীন মহকুমা) কুণ্ডুপাড়ায় মজুমদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[৮] প্রকৃত নাম হরিনাথ মজুমদার। কিন্তু কাঙাল হরিনাথ নামেই তিনি পরিচিত। ফিকির চাঁদ নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। বাংলা সাংবাদিকতার আদিপুরুষ ছিলেন কাঙাল হরিনাথ। তার পিতার নাম হলধর মজুমদার এবং মাতা কমলিনী দেবী। ১৮৪০ সালে পিতা হলধর মজুমদারের মৃত্যু হয়। শৈশবে ১৮৪১ সালে তিনি বিদ্যা শিক্ষার জন্য গ্রামের পাঠশালায় প্রবেশ করেন এবং ১৮৪৪ সালে খুলণ্ঢতাত নীলকমল মজুমদারের প্রচেষ্টায় কুমারখালীস্থ কৃষ্ণধন মজুমদারের ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করেন। কিন্তু আর্থিক কারণে তা

বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। অন্ন, বস্ত্র ও পুস্তিকাদির অভাবে তাঁকে বিদ্যালয় ত্যাগ করতে হয়। ১৮৪৫ সালে নিজ জন্মস্থান কুমারখালীতে প্রত্যহ দুই পয়সা বেতনে চাকুরি করতে হয়। কিছুদিন যেতে না যেতেই নীতিভ্রষ্ট (খাতা জাল) না করায় মালিক কর্তৃক চাকুরিচ্যুত হন। কিন্তু তাই বলে তিনি থেমে থাকেন নি। ১৮৪৯ সালে বিদ্যা শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের জন্য তিনি কলকাতায় যান। সেখান থেকে তিনি ব্যর্থ হয়ে পুনরায় কুমারখালী ফিরে আসেন। ১৮৫০ সালে তিনি 'নীল কুঠির' হেড অফিস কুমারখালীতে শিক্ষানবীশ কাজে নিযুক্ত হন। সে সময় কুঠিয়ালরা চাষীদের ওপর চরম অত্যাচার-নির্যাতন করতে থাকে। চাষীদের ওপর কুঠিয়ালদের এই অমানসিক অত্যাচার-নির্যাতন, জুলুমবাজী সহ্য করতে না পেরে তিনি নীল কুঠির কাজ ছেড়ে দেন। শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ে ১৮৫২ সালে তিনি কুমারখালী থানার চাপড়া ইউনিয়নের সাঁওতা গ্রামে স্বর্ণময়ীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বন্ধুদের সহায়তায় ১৮৫১ সালের ১৭ই জানুয়ারি হরিনাথ নিজ গ্রামে একটি 'ভানাকুলার স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিনাবেতনে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজেও বেশ কিছুদিন ওই স্কুলে অবৈতনিক শিক্ষক ছিলেন। ১৮৫৫ সালে কাঙাল হরিনাথের প্রচেষ্টায় উদ্রোমার্টিন প্রমুখদের বিদ্যালয় পরিদর্শন ও সুপারিশের ফলে সরকারি অনুদান মঞ্জুর হয়। পরের বছর ১৮৫৬ সালে তাদেরই সাহায্যে কৃষ্ণধর মজুমদার কুমারখালীতে প্রতিষ্ঠা করেন বালিকা বিদ্যালয়। তবে এই বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কাঙাল হরিনাথ (হিন্দুধর্মী) ছিলেন অগ্রদূত। যে সময় কলকাতার অধিকাংশ সুধী ব্যক্তি পর্যন্ত মনে করতেন নারী শিক্ষিত হলে 'দুশ্চরিত্রা' ও 'বিধবা' হয়, সেই সময় কুমারখালীতে 'বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করা ছিলো সত্যিই দুঃসাহসিক উদ্যোগ।[৯] চিমটেপ গৃহে কাঙাল কুঠিরে স্থাপিত এই বালিকা বিদ্যালয় নারীশিক্ষাকে সকলের সম্মুখে নিয়ে আসে। একটি জাতির উন্নতি হতে হলে নারীশিক্ষা যে খুবই প্রয়োজনীয় তা তিনি উপলব্ধি করেন। নারীদের উন্নত শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য তিনি ইংরেজি শিক্ষা অনুসরণে বাংলা, ইংরেজি, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, অংক ও সূচিকার্য প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু হিন্দু পেট্রিঅট-এ মথুরানাথের লেখা থেকে জানা যায়, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে লোকে তাঁকে কটু কথা বলতে ছাড়ে নি। শত বাঁধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও পাঠদান প্রণালী উত্তম হওয়ায় ১৮৬৩ সালে বেথুনের নির্দেশে বিদ্যালয়টি সরকারি অনুদান প্রাপ্ত হয়। কাঙাল হরিনাথের অতিশয় যত্ন ও অপরিসীম পরিশ্রমের ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাসিক বেতন বৃদ্ধি পায় এবং তিনি নিজেও মাসিক ১৫/- (পনের) টাকা বেতন নেন।[১০]

কাঙাল হরিনাথ গ্রামের সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য এবং তাদের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে সব সময় আন্দোলন করেন। মানবতা যেখানে অবহেলিত, পদদলিত সেখানেই তাঁর কণ্ঠ ধ্বনিত হয় – মানুষের জন্য সমাজের জন্য। কাঙাল হরিনাথ মোট কত খানা পুস্তক রচনা করেন তার সঠিক হিসাব নেই। তিনি অসংখ্য গদ্য-পদ্য রচনা করেন। যার ফলে মানবতা পুনঃজাগরিত হয়। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার তৎকালীন অত্যাচারিত, শোষিত, নিপীড়িত কৃষকদের রক্ষার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন, কলম ধরেন এবং

সাংবাদিকতা পেশা গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় লেখেন। পরে ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে (বাংলা ১লা বৈশাখ, ১২৭০) নিজেই কুমারখালী থেকে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন। ১৮৬৭ সালে কৃষক ও পলণ্টী জনসাধারণের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য কাঙাল হরিনাথের উদ্যোগে কুমারখালীতে 'কুমারখালী সভা' নামে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের পাশাপাশি কৃষকদের ওপর নীলকর ও জমিদারদের শোষণ-নির্যাতনের কথাও বিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়। ফলে ব্রিটিশ সরকার ও জমিদারদের পক্ষ থেকে তাঁকে ভয়-ভীতি দেখানো হয়। দেশাত্মবোধ ও সাহসিকতার জন্য পত্রিকাটি তখন সুধীমহলে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।

তাছাড়া আমরা জানি যে, কুমারখালী অনেক আগ থেকে তাঁত শিল্পের জন্য বেশ পরিচিত। আর এ কারণেই সেখানে তাঁতীরা (জোলা) বস্ত্র বয়ন ও বিক্রয় করে এবং কৃষকরা চাষাবাদের দ্বারা ফসল উৎপন্ন করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু সে সময় ঠাকুর-জমিদার এবং নীলকরদের কারণে তাঁরা তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে ১৮৭১ সালে জোলা-চাষা প্রজাস্বার্থে কাঙাল হরিনাথ কর্তৃক চক্ষুকর্ণে 'গ্রাম ও মাঠ সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে কুমারখালীতে ছোট-বড় বহু তাঁতশিল্প কারখানা গড়ে উঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় – ইস্টার্ন ফেব্রিক্স ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, বুলবুল টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, রানা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, রিপন টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ সহ অন্যান্য। পরবর্তীকালে ইস্টার্ন ফেব্রিক্স এবং বুলবুল টেক্সটাইল আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। বলতে দ্বিধা নেই যে, কাঙাল হরিনাথের অবদানের ফসল কুমারখালীর এই তাঁতশিল্প। দেশে ও বিদেশে তা আজ সুনাম বহন করে চলছে। ১৮৭৩ সালের ১৬ এপ্রিল গীতাভিনয়, 'অঙ্কুর সংবাদ' প্রকাশিত হয় এবং একই বছর 'মথুরানাথ'[১১] নামে তিনি কাঙাল কুটিরে ছাপাখানা স্থাপন করেন। এখান থেকেই 'গ্রামবার্ত্তা' পত্রিকা মুদ্রণ ও প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৭৩ সালে যখন জমিদারদের বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জ প্রজাবিদ্রোহ হয় তখন এই 'গ্রামবার্ত্তা' প্রজাপক্ষ অবলম্বনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে এবং পরবর্তী বছর ১৮৭৪ সলে দুর্ভিক্ষের সময় এই পত্রিকা জনগণকে রক্ষার্থে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে প্রজাস্বার্থে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে এই ছাপাখানা 'এম.এন. প্রেস' (মথুরানাথ ছাপাখানা) নামে পরিচিত লাভ করে। আশির দশকেও এই প্রেসটি কাঙাল কুটিরেই ছিলো। কিন্তু বর্তমানে প্রেসটি কুমারখালী রেলস্টেশন সংলগ্ন রেলগেটের পশ্চিম প্রান্তে আখ সেন্টার সংলগ্ন স্থানে স্থানান্তর করা হয়েছে। প্রেসটি রক্ষণাবেক্ষণ করছেন তারই বংশধর অশোক মজুমদার ও তাঁর দুই ছেলে দীপংকর মজুমদার এবং দেবাশীষ মজুমদার।

আমরা জানি কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেঁউড়িয়ায় বাস করতেন বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ এবং লাহিনী পাড়ায় বাস করতেন 'বিষাদ সিন্ধুর' রচয়িতা মীর মশাররফ হোসেন। কাঙাল হরিনাথ লালন এবং মশাররফ উভয়েরই বন্ধু ছিলেন। কাঙাল হরিনাথ ছিলেন অত্যন্ত নমস্য ব্যক্তি। আগেই বলেছি তিনি তাঁর 'গ্রামবার্ত্তা' পত্রিকায় স্থানীয় জমিদাররা কৃষক প্রজাদের ওপর যে নির্মম অত্যাচার-নির্যাতন চালাতেন সেগুলো তুলে ধরতেন এবং প্রজা

সাধারণকে এই জুলুমবাজীর বির"দ্ধে র"খে দাঁড়াবার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। কুষ্টিয়ায় কুমারখালীর 'শিলাইদহ' অঞ্চলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের জমিদারি ছিলো। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলে বিদ্রোহী প্রজাদের শায়েস্ড়া করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি চালু ছিলো। এরই বির"দ্ধে 'গ্রামবার্ত্তা' পত্রিকার বিভিন্ন মানবদরদী, কলামিস্টস্, কবি-সাহিত্যিক কালী কলমের মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন ও একতাবদ্ধ করতেন। যার মূল নায়ক ছিলেন স্বয়ং কাঙাল হরিনাথ।[১২]

কথিত আছে ১৮৭৫ সালে একবার ঠাকুর বাড়ির কাছারি হতে পাইকদের পাঠানো হয় গ্রামবার্ত্তা প্রকাশক ও সম্পাদক কাঙাল হরিনাথকে ধরে আনার জন্য। এই সংবাদ ফকির লালনের কাছে যায়। লালন তখন তাঁর শিষ্যদের বন্ধু কাঙাল হরিনাথের বাড়িতে পাঠান এবং নির্দেশ দেন পাইক-পেয়াদের যেন পিটিয়ে ফেরত পাঠানো হয়। এতে বুঝা যায় সাঁইজি লালন ও কাঙাল হরিনাথের মাঝে সম্পর্ক কত গভীর ছিলো।

কাঙাল হরিনাথ কুমারখালীতে সাহিত্যচর্চার এমনই একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে যার ফলশ্র"তিতে কুমারখালী সাহিত্যের তীর্থভূমি হয়ে উঠে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে 'প্রেমসুধা' দিয়ে তিনি সকলের হৃদয়ে স্থান করে নেন। এ প্রসঙ্গে কাঙালের কৃতি শিষ্য মীর মশাররফ হোসেন বলেন, "গুর"দেব তাহার (কাঙাল ফিকির চাঁদ) 'গানের দলে' ও 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'য় দলভুক্ত করিয়া আমাকে তথা মুসলিম সমাজকে যে উপকৃত করিয়াছেন তাহা কখনই মুসলিম সমাজ ভুলিতে পারিবে না"।[১৩]

১৮৭৮ সালে শিলাইদহের ঠাকুর জমিদাদের প্রজাপীড়নের চিত্র তুলে ধরে রাজশাহীতে তাঁর শিষ্য অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়র কাছে চিঠি পাঠান। ১৮৮০ সালে কাঙাল কুঠিতে বাউল ফকির লালনের গানের আসর শুর" হয়। সারাদিন গান বাজনা হয়। ঐদিন অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় উপস্থিত ছিলেন। সারাদিনের গানে ভাবের উদয় হয়। ফলে অক্ষয় কুমারের প্রস্ড়াবে 'বাউল দল' গঠন করা হয়। আর এ দলের নামকরণ করা হয় 'ফিকির চাঁদ ফকিরের বাউল দল'। ১৮৮৩ সালে শিলাইদহের ঠাকুরবাড়িতে এই দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ফলে এই দল শিলাইদহে ঠাকুর বাড়িতে উপস্থিত হয় এবং একতারা, দু'তারা, জুড়ি, তবলা হাতে তাঁরা গান পরিবেশন করেন —

"ভবপারের তরী তোদের লেগেছে তীরে
ওরে সকাতরে ডাকলে তাঁরে নেবে রে পারে
জায়গার কমি নাই নায়েতে, জাতের বিচার নাই
বসিতে,
তোরা কে যাবি রে, ভবপারের তরণীতে
চলে যাও দ্র"তগতিতে, এক হালের জোরো।
যদি নেয়ে মনে করে, ব্রহ্মান্ড নায়ে নিতে পারে
সামান্য নয় রে, এ তরী তরীর মত, বিশ্বসংসার নিতে
পারে
কিন্তু প্রেমিক ভিন্ন নিবে না রে, আসতে হয় ফিরে।

ফিকির এখন ফিকির করে, না পেয়ে নাও কেঁদে মরে
আমার কি হল রে, ভবপারে যাওয়া হল না,
আগে তাঁরে প্রেম না করে
দয়াময় পার করো মোরে, ডাকি কাতরে॥"[১৪]

কিংবা,

"ওহে দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে
তুমি পারের কর্ত্তা শুনে বার্ত্তা ডাকছি হে
তোমারে।"[১৫]

ঠাকুর জমিদাররা অতি মনোযোগে গান শ্রবণ করেন। এ গানে 'মানবতা' পুনঃজাগরিত হয়। এ সময় তিনি (কাঙাল হরিনাথ) সাংবাদিকতা ছেড়ে ধর্ম সাধনায় মনোনিবেশ করেন এবং অসংখ্য বাউল গান রচনা করেন। সে সব গান সদলে গেয়ে বেড়াতেন গ্রাম থেকে গ্রামান্ড়রে।

ড. সুকুমার সেন বলেন রবীন্দ্রনাথ 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের প্রিন্স ও মহর্ষি ঠাকুরের প্রজাসাধারণের প্রতি অত্যাচার-নির্যাতন-নিপীড়ন ও জুলুমবাজির একটি কথাও অসত্য বলে ঘোষণা করেননি। শুধু কাঙালের প্রতি অনুরোধ জানান যেন তাঁর জীবিতকালে তার পিতা ঠাকুরের এই কাহিনীগুলো প্রকাশিত না হয়। ড. সুকুমার সেন আরো বলেন, "রবীন্দ্রনাথের আগে বাউল গান যাকে ইংরেজিতে vogue বলে তা হরিনাথই সৃষ্টি করেছিলেন।"[১৬] তাছাড়া সুরেন্দ্রনাথ, ডা. প্রথমনাথ চক্রবর্তী ও সোনাউলণ্ঢাহের মতে, 'হিতকরী' প্রকাশের পূর্বে সাত বেহারার পালকিতে যতীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কুমারখালীর কাঙাল কুটিরে গমন করেন। উলেণ্ঢখ্য যে, ১৮৯০ সালে কাঙাল হরিনাথের অনুপ্রেরণা ও পূর্ণসহযোগিতায় মীর মশাররফ হোসেন প্রতিষ্ঠিত ও সতীষচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত পাক্ষিক 'হিতকরী'র আত্মপ্রকাশ পায়। অতঃপর ১৮৯৬ সালের ১৬ই এপ্রিল (বাংলা ১৩০৩, ৫ই বৈশাখ) বৃহস্পতিবার তিনি স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতে বিদায়ের বার্তা নিয়ে স্বজ্ঞানে পরপারে চলে যান।[১৭]

তাহলে দেখা যায়, বাংলার বাউল সাধক শ্রেণীর সাথে কাঙাল হরিনাথের সম্পর্ক অতিঘনিষ্ঠ ছিলো। বিশেষ করে বাউল সম্রাট সাঁইজি লালনের সাথে তো বটেই। সাঁইজি লালন ছিলেন তাঁর বন্ধুস্বরূপ। সাঁইজি লালনের পিতৃ-মাতৃ পরিচয় যেমন ছিলো না; তেমনিভাবে পরিচয় থাকা সত্ত্বেও কাঙাল হরিনাথ মজুমদার শিশুকালেই পিতা-মাতা হারিয়ে কাঙাল হয়ে পড়েন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার নবজাগরণে কাঙাল হরিনাথের অবদান অবিস্মরণীয়। বাউল সম্রাট লালনের প্রভাবেই তিনি 'ফিকির চাঁন্দ ফকিরের বাউল দল' গঠন করে সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত, অসহায়, নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের মুক্তির কথা বলেন। তাছাড়া 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় লেখনীর মাধ্যমে ইংরেজ ও জমিদার কর্তৃক অসহায় মানুষের প্রতি অত্যাচার-নির্যাতন-জুলুমবাজির অসহনীয় বর্ণনা তুলে ধরে মানবতার দ্বার উন্মোচনে সহায়তা করেন।

সাঁইজি লালনের ন্যায় তিনিও মানবতার পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। সাঁইজি লালনের মানবপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে তিনিও বিস্ড়র 'বাউল সঙ্গীত' রচনা করেন এবং তা হৃদয়স্পর্শী। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার 'ফিকিরচাঁদ ফকিরের বাউল দল' এর নেতা ছিলেন। তবে কাঙাল হরিনাথ শুধুমাত্র 'বাউল-সঙ্গীত'ই রচনা করেননি, 'ব্রহ্মসঙ্গীত', 'ঐতিহাসিক সঙ্গীত', 'কালী কীর্ত্তন' প্রভৃতি রচনা করেন। বলা যায় বাউল সঙ্গীতের মধ্যে ফিকির চাঁদ ফকিরের সুর একপ্রকার স্বতন্ত্র। সঙ্গীতের ধারা শুধু বিনোদনের জন্যই নয় এ কথা লক্ষ্য রেখে কাঙাল হরিনাথ সামাজিক অবক্ষয় নিরসনকল্পে ফকির লালনের মতো সাম্প্রায়িদকতার বির"দ্ধে সোচ্চার হতে সুর ও লেখনির দ্বারা মানুষকে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি ছিলেন সমাজকর্মী ও শিক্ষাব্রতী। সাঁইজি লালনের ন্যায় তিনিও উদারচিত্ত ও নারীমুক্তিতে আস্থাশীল। নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য কাঙাল হরিনাথ কুমারখালীতে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সহমরণ প্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের বির"দ্ধে ও বিধবা বিবাহের পক্ষে তিনি অবস্থান নেন। তাঁর সমস্ড় জীবনকর্মে উজ্জ্বল হয়ে আছে তার অসাম্প্রদায়িক মানবভাবনা, অন্যায়-অবিচারের বির"দ্ধে লড়াই-সংগ্রাম ও প্রতিবাদ এবং নির্ভীক সাংবাদিকতা। অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতনের বির"দ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি বিদেশী ইংরেজি থেকে শুর" করে দেশী সামন্ড় প্রভু কাউকেই ছাড় দেন নি। তিনি ঠাকুর পরিবারের (রবীন্দ্রনাথ পূর্ব) প্রজাপীড়নের বির"দ্ধে র"খে দাঁড়ান। অসহায় প্রজাদের কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায়ের কথা কাঙাল হরিনাথ তাঁর 'গ্রামবার্ত্তায়' ফলাও করে প্রচার করেন। এজন্য তাঁর জীবনদ্দশায় হুমকি-ধামকি আসলেও সত্য প্রকাশে তিনি কখনো বিচ্যুত হন নি। কথিত আছে, এ ব্যাপারে সাঁইজি লালন তাঁকে সাহায্য সহযোগিতা করেন। পরাধীনতার গণ্ডানি ও দুঃখ, কত যে বেদনাদায়ক ও তীব্র 'গ্রামবার্ত্তায়' (জুলাই ১৮৬৯) মানবদরদী কাঙাল হরিনাথ মজুমদার তা বর্ণনা করেন – 'পরাধীনতার কত দুঃখ, কত যাতনা, তাহা পরাধীনেরাই বিশেষ অবগত আছেন। হতভাগ্য বঙ্গসন্ড়ান চিরকাল পরাধীন। চিরকাল পরের লাথি খাইতে খাইতে তাহাদের জীবন অতিবাহিত হইল।' তাই তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয় —

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
– কে বাঁচিতে চায়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে
কে পরিবে পায়।"[১৮]

এই স্বর্গীয় বীরোণযোগী বাক্যের অর্থ পরাধীনেরা কখনও সম্যকরূপে পরিগ্রহ করতে পারবেন কি? যে দেশের লোকে গর্ব সহকারে এই প্রকার উৎসাহ বাক্য বলতে পারে, তারাই সুখী, তারাই মনুষ্যপদবাচ্য। তাঁরা অন্ধ পাশ্চাত্য অনুকরণে দেশের প্রকৃত সমস্যা অনুধাবন ও তাঁর প্রতিকারে যথাযথ ভূমিকা পালন করেন না। তাঁদের কাছে মাতৃভূমির দুর্দশা মোচনের আশা নিরাশামাত্র। কিন্তু শক্তি ও পৌর"ষহীন কৃপাপ্রার্থী বাক্যবাগিশ বাঙালির আচরণ ও মানসিকতাকে ধিক্কার দিয়ে দীন দরদী হরিনাথ আক্ষেপ করে বলেন– "আমাদের দেশের অধিবাসীদিগকের এই প্রকার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, আমরা কোন এক জাতীয় মনুষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

ইংরেজদের কৃপাবলে আমরা কিঞ্চিৎ ইংরেজি শিখিয়া আমাদিগকে অতি মহত মনে করি এবং আমরা একটি জাতি বলিয়া অহঙ্কার করি; এমন কি কেহ কেহ স্বাধীনতা লইয়া বাগাড়ম্বর করিতে ত্র"টি করেন না।"১৯

তিনি যুবশক্তির প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান– "হে দেশীয় যুবকগণ। বৃথা আপনাদের গরিমা ছাড়, জাত্যাভিমান ছাড়িয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র একত্র হও, একতা অভ্যাস কর, বল চালনা অভ্যাস কর, যাহাতে মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল হইবে; যে সকল কুপ্রথার দাসত্ব করিয়া দুর্বল হইতেছে, তাহাদিগকে মুহূর্ত মধ্যে দূর করিয়া দেও - দেখো আমাদের স্বাধীনতার অবস্থা দেখিলে কেবল ক্রন্দন করিতে হয়, যে দিন জন্মভূমির দুরাবস্থা মনে হয়, কত অসুখেই সেদিন গত হয়। মনে হয় এ দুঃস্থ যন্ত্রণার বুঝি কখনই অবসান হইবে না (এপ্রিল ১৮৭৪)।"[২০]

তথাপিও তিনি আশাবাদী। তাই বোধহয় মানবদরদী কাঙাল হরিনাথের প্রবল আগ্রহ ও নির্ভরতা জন্মেছিলো দেশপ্রেমিক যুবক ও মধ্যশ্রেণীর মানুষের প্রতি যুগে যুগে যাদের দ্বারা সমাজ সংশোধিত ও পৃথিবী উপকৃত হয়ে আসছে।

সুতরাং সাঁইজি লালন ও কাঙাল হরিনাথের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র ছিলো। লালন ফকিরের পরিচিতিমূলক আলোচনা মুদ্রণ আকারে রচনা 'গ্রামবার্ত্তায়' লক্ষ্য করা যায়।[২১] এ পর্যন্ড় প্রাপ্তব্য তথ্যে জানা যায় সাঁইজি লালনের গান তাঁর জীবদ্দশায় সংগ্রহ করে প্রথম মুদ্রণ করেন কাঙাল হরিনাথ।[২২] তাই রাধাচরণ রায় কাঙাল হরিনাথ মজুমদারকে 'আধুনিক বাউল কবি' বলে আখ্যায়িত করেন; 'ফিকিরচাঁদ বাউল' বলেও সম্বোধন করেন এবং বাউল সঙ্গীতের ভাষায় যা সম্পদ, ফিকির চাঁদ তা সফলভাবে শিক্ষিত মহলে প্রচার করেন। তিনি কাঙাল হরিনাথকে লালন পরবর্তী আধুনিক বাউল গানের আদিগুর" বলে উলেণ্ডখ করেন। তিনি আরো বলেন, তাঁকে কেন্দ্র করেই আধুনিক ফিকির চাঁদ বাউল সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়।[২৩]

সহজেই অনুধাবন করা যায়, সাঁইজি লালনের ন্যায় কাঙাল হরিনাথও সত্য, শুভ ও মঙ্গল কামনায় আত্মদর্শনের কথা তাঁর সঙ্গীতে বার বার উলেণ্ডখ করেন। আত্মোপলব্ধির ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে তিনিও ঈশ্বর দর্শনের কথা বলেন। তাইতো তিনি বাউলের সুরে গান–

"মনে না বিবেক হলে, ভেক লইলে
কেবল রে তার বিড়ম্বনা।
মনে তোর টাকা কড়ি, কোটা বাড়ি
কীসে হবে সেই ভাবনা।
বাহিরে তিলক ঝোলা, জপের মালা
দেখে তো ভাই সে ভুলবে না।
বাহিরে মোড়া মাথা, ছেঁড়া কাঁথা,
মনের মধ্যে কুবাসনা
তাইতো মাগির তরে, ভিক্ষা করে,
বেড়াও আসল ঠিক থাকে না ॥

কাঙাল কয় কুবাসনা মনের মধ্যে,
থাকলে না হয় উপাসনা।
যদি বৈরাগী হতে, ইচ্ছে তবে,
ছাই করো ভাই কুবাসনা ॥"[২৪]

সাঁইজি লালনের ন্যায় তিনি জাত-পাত বিচারে সকল মানুষ সমান ভাবেন। হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষে তাঁর মনে পীড়া জাগায়। এক্ষেত্রে দেখা যায় লালন শাহ ও কাঙাল হরিনাথের মাঝে ভাবের আদান-প্রদান হয়েছে। কাঙাল হরিনাথ সঙ্গীতের মাধ্যমে তা তুলে ধরেন:

"জাতির নামে ধুয়া তুলে
খড়ো ঘরে আগুন জ্বেলে
এ জাত যে, জাত মারবার কল
নদীর জল করছি পান
একই জমির খাচ্ছি ধান
একই ভাষায় গাইছি গান
ভায়ের বুকে ছুরি মারে
শয়তানের দল।"[২৫]

সুতরাং বাউল শ্রেষ্ঠ লালন এবং কাঙাল হরিনাথ উভয়েই মানবতার পূজারী ছিলেন। তাঁদের জীবন-দর্শনে মানুষের স্থান সবার উপরে। মানুষের জন্যই তাঁরা সারাজীবন সংগ্রাম করেন। মানুষের কল্যাণই ছিলো তাঁদের জীবনের চরম লক্ষ্য। তবে পার্থক্য সাঁইজি লালন যেখানে 'মানুষ'কে ভালবেসে 'মনের মানুষ' তথা 'স্রষ্টা' পাওয়ার প্রত্যাশায় মুখে মুখে গান রচনা ও পরিবেশন করেন কাঙাল হরিনাথ মজুমদার সেখানে মুখে মুখে গান পরিবেশন ছাড়াও তা লিপিবদ্ধ করেন এবং লেখনীর মাধ্যমে অসহায় মানুষের কথা, কৃষক সমাজের দুঃখ-দুদর্শার ভয়াবহ চিত্র 'গ্রামবার্ত্তা' পত্রিকায় তুলে ধরেন। তাছাড়া সাঁইজি লালন যেখানে সমাজব্যবস্থার বাইরে এসে প্রচলিত ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের উর্ধ্বে উঠে বাউল মতাদর্শের আলোকে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেন; কাঙাল হরিনাথ সেখানে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের জমিদারীত্বের আওতাধীন অঞ্চলে প্রচলিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিবেষ্টিত সমাজব্যবস্থার মাঝে বসবাস করেও প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত জীবনব্যবস্থার কথা বলেন। কিন্তু ধর্মকে একেবারে বিসর্জন দেন নি। ধর্মীয় প্রভাব বলতে তিনি মূলত ধর্মীয় কুসংস্কারকে বুঝান।

সুতরাং সাঁইজি লালন এবং কাঙাল হরিনাথের মধ্যকার সম্পর্ক ছিলো আত্মিক; আত্মার আত্মীয়তা। 'মানবতা' ও 'মানবধর্ম'ই উভয়ের চিন্ড়রাজ্যে প্রাধান্য পায়। বাউল শ্রেষ্ঠ লালনের পর ঊণবিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকের মহাত্মা হরিনাথ মজুমদার বঙ্গীয় 'বাউলগান' রচয়িতাগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলে স্বীকৃত।

সাঁইজি লালনের ন্যায় কাঙাল হরিনাথের রচনাও খুব উচ্চ শ্রেণীর এবং ভাবগাম্ভীর্য ও তত্ত্বকথায় সমৃদ্ধ সরল প্রাঞ্জল ভাষার গুণে চিত্তাকর্ষক। ঊণবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মিষ্টিকদের মধ্যে কাঙাল হরিনাথ ওরফে ফিকির চাঁদের স্থান খুব বৈশিষ্ট্যময়। বাংলাদেশে

বিরাজমান সন্ত্রাস, অন্যায়-অবিচার, দুর্নীতি, দূর্বৃত্তায়ন, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি স্বাধীন জাতিকে অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করছে। ধর্মের স্বার্থান্ধ ব্যবহার, লোভ-লালসার যথেষ্ট কারবার আর সাম্প্রদায়িক উগ্রতা রুদ্ধ করছে 'মানবতার মুক্ত অন্বেষা'। নেই মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সাহসিকতা, নেই নৈতিকতা। এই প্রেক্ষাপটে 'মানবতার মুক্তিকল্পে' মানবপ্রেমিক ফকির লালন শাহ এবং নির্ভীক সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও মানবদরদী কাঙাল হরিনাথ মজুমদার-এর জীবন-দর্শন একান্ড়ভাবে প্রাসঙ্গিক।

তথ্যনির্দেশ

১ ড. মো. খালেদউজ্জামান, *লালন দর্শনে মানবতাবাদ*, (পি-এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ), দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ ২০১০, পৃ. ২২।

২ মতিলাল দাস ও পীযুষকান্ড়ি মহাপাত্র (সম্পাদিত), *লালন গীতিকা*, কলকাতা, ১৯৫৮, পৃ. ৯, ১৪, ১৫, ৫২।

৩ মো: সোলায়মান আলী সরকার, *লালন শাহের মরমী দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, জুন ১৯৯৪, পৃ. ৩।

৪ উদ্ধৃত: মুনশী আবদুল মাননান, *লালন শাহ: বিবেচনা-পুর্ণবিবেচনা*, বইপত্র প্রকাশনা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৫, গান নম্বর-৫১, পৃ. ১০৭।

৫ আহমদ ছফা, *লালন ফকির: হিন্দু কি যবন*, প্রথম আলো (সাময়িকী) ০৩ নভেম্বর ২০০০ (বাংলা ১৯ কার্তিক ১৪০৭)।

৬ উদ্ধৃত: মুনশী আবদুল মাননান, *লালন শাহ: বিবেচনা-পুনবিবেচনা*, গান নম্বর-৫২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮।

৭ উদ্ধৃত: আহমদ শরীফ, *বাউল তত্ত্ব*, পড়ুয়া প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ৪৪।

৮ ড. আশরাফ সিদ্দিকী, কাঙাল হরিনাথ, *কাঙাল হরিনাথ স্মরণে*, ১৬১তম জন্মবার্ষিকী, ১৪০১ সন (স্মরণিকা), কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

৯ ম. মনিরউজ্জামান, *কাঙাল হরিনাথের মানস-চেতনা* (প্রবন্ধ), কাঙাল হরিনাথ স্মরণে ১৬১তম জন্মবার্ষিকী, ১৪০১ কুমারখালী কুষ্টিয়া থেকে প্রয়োজনীয় অংশটুকু নেওয়া হয়েছে।

১০ মাহমুদ হাফিজ (স্টাফ রিপোর্টার দৈনিক জনকণ্ঠ), *অসাম্প্রদায়িক কাঙাল হরিনাথ: আজকের প্রাসঙ্গিকতা*, ১৬১তম জন্মবার্ষিকী ১৪০১, প্রাগুক্ত।

১১ পাদটীকা: মধুরানাথ কুন্ডু একজন বড়মাপের সমাজসেবক ছিলেন। কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ঐতিহ্যবহনকারী 'এম.এন. পাইলট হাইস্কুলের' প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কুমারখালী শহরে তাঁর নামের সূত্রধরে 'কন্ডুপাড়া' অতিশয় পরিচিত।

১২ মাহমুদ হাফিজ (স্টাফ রিপোর্টার দৈনিক জনকণ্ঠ), *অসাম্প্রদায়িক কাঙাল হরিনাথ: আজকের প্রাসঙ্গিকতা*, প্রাগুক্ত।

১৩ উদ্ধৃত: কাঙাল হরিনাথ, *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা* [পাক্ষিক পত্রিকা], ১৮৬৬ সাল।